Vol. 44 | No. 3 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহমদ শরীফের বিদ্যাচর্চার প্রধান ভুবন

Volume	44
Issue	3
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ কবির
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v44i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i3.1
Pages	1-9
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ চুয়াল্লিশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪০৮ ॥ জুন ২০০১ (প্রকাশকাল : জুন ২০০২)

Check for updates

আহমদ শরীফের বিদ্যাচর্চার প্রধান ভুবন

আহমদ কবির*

জীবন রচনা করতে হয়, আর বিদ্যা অর্জন করতে হয়। বিদ্যার্জনে বিদ্যানুরাগ আবশ্যিক শর্ত। জগৎ সংসারে বিদ্যাপথযাত্রীর সংখ্যা খুব কম। বেশির ভাগ মানুষ জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকামনায় ও বিত্তবাসনায় মশগুল থাকে। তবু সংস্কৃতিবান ও রুচিশীল মানুষ, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যামোদী ও শিক্ষাদাতারা আছেন বলে বিদ্যাচর্চা অব্যাহত থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভের জন্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ঐসব কেন্দ্রে মেধাবী ছাত্রও জন্ম নেয়। কিন্তু মেধার কর্ষণ না হলে মেধা মরে যায়। সেজন্য দেখা যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুব ভাল পাশ, কিন্তু পরবর্তী জীবনে বিদ্যার সঙ্গে সংযোগবিচ্ছিন্ন। এসব তথাকথিত মেধাবী জ্ঞানরাজ্যে কোন অবদান রাখতে পারে না। জ্ঞানার্জন নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ব্যাপার। ধ্যানীর মতো সাধনা না করলে কোন সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

অবশ্য শিক্ষিত বাঙালির বিদ্যানুরাগ সুবিদিত এবং এ-অনুরাগের ঐতিহ্যও বহুদিনের। মধ্যযুগ থেকেই শিক্ষিত বাঙালি বিদ্যাচর্চা করে আসছে। তখন ছিল ধর্মের যুগ। দেশজ ধর্মের সঙ্গে বহিরাগত ধর্মের সংঘাত ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল নতুন চিন্তা, নতুন সংস্কৃতি ও নতুন ভাবধারা। এরই অভিপ্রকাশ ঘটল নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের চিন্তাচেতনায় ও সাহিত্যসাধনায়। মধ্যযুগে বৃহৎবঙ্গে গৌড়, নবদ্বীপ, মিথিলা, রোসাঙ্গ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি ছিল বিদ্যাকেন্দ্র। শিক্ষার্থীরা পণ্ডিতেরা, সাধকেরা এবং কবিযশপ্রার্থীরা এসব জায়গায় ভিড় করতেন। রাজানুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অকুণ্ঠিত। দরবারি সংস্কৃতিতে যোগ্য লোকের কদর সবসময় হয়েছে, দৃষ্টান্ত আলাউল ও ভারতচন্দ্র। এঁরা ছিলেন উৎকৃষ্ট কলাবিদ ও বিদ্বান। মধ্যযুগে বিদ্যাবত্তার প্রকাশ ঘটেছে কাব্যাঙ্গিকে ; প্রধানত উপাখ্যান রচনায়, শাস্ত্রকথায়, ধর্মপুরুষের দিব্য চরিতাখ্যানে, তত্ত্বমূলক গীতভাষ্যে, কিংবা স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র ব্যাখ্যায়। নদীয়ার বৈষ্ণব শাস্ত্রীরা বিদ্বান বলে পরিচিত ছিলেন ; তেমনি ছিলেন সুফি ও মরমী কবিরা। বাংলার অধ্যাত্ম সাধনার মননগত পরিচর্যা আছে। এর গূঢ় তত্ত্বগুলো নানা ভাব চিন্তা কর্ম ও চেতনার অভিব্যক্তি। বিশ্লেষণ, বিচার, তর্কপ্রতর্ক, সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাগুলো ছিল সূক্ষ্ম, প্রগাঢ় ও ভাবোদ্রেককারী। এগুলো গভীর অধ্যয়নেরও প্রকাশক। ভাববাদী মধ্যযুগের সাধনায় বিদ্যাবত্তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে মাঝে মাঝে গুরুতর সমাজজিজ্ঞাসার সন্ধানও যে পাওয়া যায় না এমন নয়। সেসময়ও রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজভাবনা, রাজনীতিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, বাণিজ্যবিদ্যা, সংস্কৃতিচর্চা সবই ছিল; কিন্তু একালের মতো এই সব আধুনিক বিদ্যার এলাকা প্রভূতভাবে কর্ষিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয় নি। সেকালে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্রকৌশলের উদ্ভাবন না ঘটায় মানুষের ধ্যানধারণায় ছিল স্থবিরতা, গতানুগতিকতা ও বদ্ধতা।

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদ্যাচর্চার প্রধান এলাকা ছিল ধর্ম ও দর্শন। ভূয়োদর্শনও একপ্রকার দর্শন বটে। যেহেতু তা জগৎ সংসারের নিয়ম ও মানবিক আচরণের কিছু চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি। সন্দেহ নেই, ভূয়োদর্শন অভিজ্ঞতা নির্ভর এবং তা লোকাচারে ও লোকসাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। বিজ্ঞানবোধ ছিল না বলে মধ্যযুগের বাঙালি একদিকে অবারিত কল্পনাবিলাসী হয়েছে এবং পরীর কেসসা ও অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক অভিযানপূর্ণ প্রণয়কাহিনী বা যুদ্ধকথা রচনা করেছে ; অন্যদিকে ধর্মের অলৌকিকতায় ও দিব্য ভাবনায় বাঁধা পড়ে সৃষ্টি করেছে নানা শাস্ত্র, দর্শন ও জ্ঞান। এসব জ্ঞানই প্রধানভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ব্যক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, দীর্ঘ পাঁচশ বছর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং সমৃদ্ধি অর্জন করেছে।

মধ্যযুগের সাহিত্যের বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য ও গভীরতা বিষয়ে পুরো ধারণা উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির ছিল না। মধ্যযুগের সাহিত্য বলতে তারা বুঝত রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য ইত্যাদি। এটা ঠিক যে, উনিশ শতকে পাশ্চাত্য বিদ্যার সুবাদে নতুন চৈতন্যপ্রাপ্ত কোলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি প্রাথমিকভাবে সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং এগুলোর প্রকাশ ঘটেছিল তাদের বিভিন্ন কর্মপ্রেরণায়, সামাজিক আন্দোলনে ও সাহিত্যসৃষ্টিতে। পরে জাতীয় ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য অনুসন্ধানের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। জাতির সাংস্কৃতিক কর্মপ্রেরণার কথা মনে রাখলে বলতে হবে এটি ছিল জরুরি কাজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো গুরুতর বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানগুলির অনুসন্ধান প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয়। বাঙালির শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট এবং উনিশ শতকের বাঙালি মননের প্রতিভূ পুরুষ। বঙ্কিমের ও তাঁর পূর্বসূরি রামগতি ন্যায়রত্নের কিংবা উত্তরসূরি রমেশচন্দ্র দত্ত ও দীনেশচন্দ্র সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক রচনায়[১] বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন *চর্যাপদের*, মধ্যযুগের প্রথম লিখিত নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* এবং মুসলমান রচিত পুথি-সাহিত্যের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কারণ তখন পর্যন্ত উক্ত পুথিগুলি আবিস্কৃত হয়নি। সুতরাং পুথিকারদের বিষয়ে কোন অবহিতি তাদের থাকার কথা নয়। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধে কাহ্নপা, শবরপা, ভুসুকুপা এবং আলাউল, সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান কেউ নেই। একই কারণে দীনেশচন্দ্র সেন রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থে এরা কেউ ছিলেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান দীনেশচন্দ্র সেনের লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ অবশ্যই অমূল্য এবং এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। লুপ্ত পুথির অনুসন্ধান ও সংগ্রহ কাজে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উজ্জ্বল ভূমিকার কথা এখন কিংবদন্তিতুল্য। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের দুটি আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসন্ধানে দুটি মাইলফলক এবং এগুলো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্গঠনে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের পুথিসংগ্রহ-কীর্তি সুউচ্চ মিনারতুল্য। এ কীর্তি প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য ও সহায়তা বর্জিত একক ব্যক্তির। ব্রিটিশ ভারতের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কোলকাতা থেকে বহু দূরপ্রান্তস্থিত চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে তিনি যে

বিপুল পরিমাণ বাংলা পুথি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেছেন তাতে বাংলা সাহিত্যের একটি অন্ধকার এলাকা সম্পূর্ণ আলোকিত হয়েছে এবং এতে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসও পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পরে একসময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও যুক্ত হন। পরিষদ তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছে এবং তাঁর *বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ* নামের মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশ করেছে। চিরদিন মফস্বলবাসী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে এবং বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে নিবন্ধ লিখে বিদ্যাচর্চার যে ঐতিহ্য গড়ে তুললেন তারই উত্তরাধিকার বর্তাল আহমদ শরীফের উপর।

আহমদ শরীফ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ভাইপো। পিতৃব্যের সংগ্রহ-প্রয়াসধারা ও বিদ্যাচর্চার আবহেই তিনি বড় হয়েছেন। দেখেছেন সারাজীবন কী পরিমাণ মমতা, অনুরাগ ও প্রযত্ন দিয়ে পিতৃব্য বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। আহমদ শরীফ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন (১৯৪৪) তখন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বৃদ্ধ। তাঁর অবর্তমানে তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয়ের কী ব্যবস্থা করবেন সেটি নিশ্চয়ই সাহিত্যবিশারদেরও ভাবনার বিষয় ছিল এবং এটিও তিনি নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছিলেন কার উপর এ দায়িত্ব তুলে দেবেন। এম.এ ডিগ্রি লাভের পর কয়েক বছর আহমদ শরীফের কর্মজীবন যখন ইতস্ততবিক্ষিপ্ত তখন সাহিত্যবিশারদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছয়শ'র মতো পুথি দান করে[২] আহমদ শরীফের আগ্রহে এই মর্মে অনুরোধ করলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন আহমদ শরীফকে গবেষক হিসেবে নিয়োগ দেন, তাহলে তাঁর প্রদত্ত পুথিগুলির সদ্গতি হবে। উনিশ শ পঞ্চাশে আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগ দেন। তখন আহমদ শরীফের শিক্ষক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা বিভাগের প্রধান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও শিক্ষকতার কাজ পেয়ে আহমদ শরীফের বিদ্যা-অন্বেষা অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত গতিধারা লাভ করল। সেই থেকে তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পঠন পাঠন ও গবেষণাকে ধ্যানজ্ঞান করলেন, বিশেষ করে পুথি-সাহিত্যের গবেষণা, যার প্রশিক্ষণ তাঁর আগে থেকেই ছিল। এখন অনুকূল অবস্থানে এসে তিনি প্রাচীন পুথিগুলোর পরিচয় দানে ও সম্পাদনায় অর্থাৎ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। পুথি গবেষণায় পূর্বসূরি বিশারদেরা অবশ্যই ছিলেন ; যেমন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, যিনি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কবিতা সংকলন *Buddhist Mystic Songs* ও আলাউলের *পদ্মাবতী* সম্পাদনা করেছেন ; কিংবা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক যিনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সহযোগে *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* রচনা করেছেন ; ছিলেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন যিনি প্রধানত বাউল গানের সংগ্রাহক হিসেবে খ্যাত ; অথবা ছিলেন আহমদ শরীফের সমকালে তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ অধ্যাপক আলী আহমদ। আর পশ্চিমবঙ্গের পুথিবিশারদ ও বিশেষজ্ঞদের প্রসঙ্গ তো রয়েছেই। কিন্তু আহমদ শরীফের মতো, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্য কোন গবেষক এত সংখ্যক বাংলা পুথি নিয়ে গবেষণাও করেন নি, সম্পাদনাও করেন নি।

সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশে নতুন সময়-পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রকাঠামোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বিদ্যাচর্চার যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সৃষ্টি হচ্ছিল বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ের চর্চা ও গবেষণা তার অন্তর্ভুক্ত। শুধু বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও গবেষকেরা নন, অন্য বিভাগের বিদ্বানেরাও জাতির ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানচর্চায় যুক্ত হলেন। বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীকে বেশি করে স্বদেশমুখী হওয়ার চেতনা দিয়েছিল। এর প্রকাশ যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবনায় ঘটল, তেমনি তা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অভিব্যক্ত হল। ভাষা-আন্দোলনের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই এর প্রমাণ। জাতির আত্মস্বরূপ সন্ধানে ভাষা ও সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শুধু একালের সাহিত্য জানলে তো চলবে না, সেকালের সাহিত্য সম্বন্ধেও জানতে হবে। জাতীয় বিকাশ তাৎক্ষণিক কোন ব্যাপার নয়, এর পূর্বাপর ইতিহাস ও সম্বন্ধসূত্র আছে। যে ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান পরে বাংলাদেশ হল, সেই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা যে নিতান্ত 'বাঙ্গাল' নন এবং তাদের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অতীত যে সমৃদ্ধ, সেইটি না জানলে জাতির পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের লোকসংখ্যার সিংহভাগ মুসলমান। এই জনগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধর্মদেশনা, সামাজিক জীবনরূপ, সাংস্কৃতিক চেতনা এবং ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাদের অভিপ্রায় মধ্যযুগের মুসলমান রচিত পুথি-সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং এ সাহিত্যের গবেষণার গুরুতর প্রয়োজন রয়েছে। আহমদ শরীফ জাতির স্বরূপ সন্ধানের তাগিদে মধ্যযুগের পুথি সাহিত্যের গবেষণা করেছেন পিতৃব্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রেরণার কথা মনে রাখলে তাঁর পুথি-সাহিত্য গবেষণার তাৎপর্য মিলিয়ে নেওয়া যায়।

আহমদ শরীফ পুথির সংগ্রাহক নন, কিন্তু পরিচায়ক, সম্পাদক, গবেষক ও বিশ্লেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক প্রদত্ত ছয়শ পুথির পরিচিতি সম্পাদনা করেছেন আহমদ শরীফ, আর পুথি সাহিত্যের সম্পাদনার সূচনাও হল দৌলত উজির বাহরাম খানের *লায়লী মজনু* দিয়ে। সারাজীবন ব্যেপে আহমদ শরীফ চল্লিশটিরও বেশি পুথি সম্পাদনা করেছেন। উচ্চতর ডিগ্রিও লাভ করেছেন মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতানের উপর গবেষণা করে। সুতরাং পুথি সাহিত্যে হচ্ছে আহমদ শরীফের বিদ্যাচর্চার একান্ত এলাকা। এবং এতে গবেষণা করার জন্যই তিনি মধ্যযুগের সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুখ্যাত। এই খ্যাতির মহিমা বুঝে নিতে হবে। আহমদ শরীফ যদি কেবল পুথি-সম্পাদনা, পরিচিতি দান কিংবা পুথির সাহিত্যগুণ বর্ণনা করতেন তাহলে তাতে অধ্যাপকসুলভ এক ধরনের কাজের পরিচয় পাওয়া যেত। এসব কাজ তিনি অবশ্যই করেছেন, কিন্তু এ-সবের সঙ্গে যেটি লক্ষণীয় তা হল পুথির ভাববস্তু বিশ্লেষণ এবং বাংলার ভাব সাধনার সঙ্গে সে-বিশ্লেষণের সম্বন্ধ স্থাপন। আহমদ শরীফের সম্পাদিত পুথির সবগুলো প্রণয়োপাখ্যান বা রোমান্স কাহিনী নয়, হয়তো কোন কোনটি, যেমন মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী*, দোনা গাজীর *সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল*, কোরেশী মাগনের *চন্দ্রাবতী* কিংবা শমসের আলীর *রেজওয়ান শাহ* ; কিন্তু বেশির ভাগ পুথির ভাববস্তু তত্ত্ব, দর্শনচিন্তা বা শাস্ত্রনির্ভর। এমনকি

রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানগুলিও হয়তো তত্ত্বনির্ভর ; যেমন *লায়লী মজনু*। *লায়লী মজনু* জাতীয় মুসলমান রচিত মধ্যযুগের পুথি আরবি-ফারসি-হিন্দি উৎসজাত অনুবাদমূলক রচনা। এগুলোর মধ্যে অধ্যাত্মচিন্তার কিংবা প্রেমবাদী সুফিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, রূপক ভঙ্গিতে হলেও। আবার অন্যত্র পাওয়া যায় মুসলমানদের ধর্মচিন্তা, সাধনরীতি, শাস্ত্রভাবনা, আল্লাহর প্রশস্তি, নবীর ছিফত ও চরিত কথা, ধর্মীয় দর্শন ইত্যাদি; কিংবা বিশেষ জ্ঞান বা বিদ্যা, অথবা মুসলিম ইতিহাসের উপাখ্যান। এসব বিষয় নিয়ে রচিত পুথির মধ্যে রয়েছে আলাউলের *তোহফা* ও *রাগতালনামা*, সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* ও *রসুল চরিত*, জয়েনউদ্দীনের *রসুল বিজয়*, মুহম্মদ খানের *সত্যকলি বিবাদ সংবাদ*, মুজাম্মিলের *নীতিশাস্ত্রবার্তা*, আফজল আলীর *নসিহতনামা*, শেখ মুত্তালিবের *কিফায়তুল মুসল্লিন* ও *কায়দানী কিতাব*, মুহম্মদ ফসীহর *আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত*, খোন্দকার নসরুল্লাহর *শরীয়তনামা*, আবদুল করিম খোন্দকারের *হাজার মসায়েল* ও *নূরনামা* ইত্যাদি। শাস্ত্র বিষয়ক এসব পুথির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে অন্যান্য গুরুতর গ্রন্থ যেমন বিদ্যাপতির *ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী*, ব্রজমোহন দাসের *চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ*, *মুসলিম কবির পদসাহিত্য*, *মধ্যযুগের রাগতালনামা*, *সওয়াল সাহিত্য*, *বাঙলার সূফী সাহিত্য*, *বাউলতত্ত্ব* ইত্যাদি, যেগুলি কোন-না-কোনভাবে বাংলার অধ্যাত্মসাধনার রূপাভিব্যক্তি। বাংলার মধ্যযুগের ভাবপ্রত্যয়ের প্রকৃতি ও রূপরস বোঝার জন্য আহমদ শরীফ গভীরভাবে পড়ে নিয়েছিলেন নানা ধর্মপুস্তক, শাস্ত্র ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ, পুরাণ, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব। ব্যাপক অধ্যয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গভীর উপলব্ধি, প্রচুর তথ্য ও বর্ণনার সমারোহ, যুক্তিবুদ্ধির শাণিত উপস্থাপনা এবং বিশ্লেষণী ভাষা। এই বৈশিষ্টাবলি মধ্যযুগের সাহিত্য প্রাসঙ্গিক আহমদ শরীফের যাবতীয় রচনাকে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ করে তুলেছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত উপকরণনির্ভর আহমদ শরীফের গবেষণা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় পূর্ণতা এনে দিয়েছে। এবং এই সত্য বুঝিয়ে দিয়েছে যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাধনার যোগফল।

বাংলার ধর্মদর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে আহমদ শরীফের মনোযোগ ছিল নিবিড়, এর প্রকাশ দেখা গেছে মধ্যযুগের সাহিত্য আলোচনায়। সমন্বয়ী ধর্মসাধনার প্রসঙ্গ আহমদ শরীফ সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে চেয়েছেন। ধর্ম, সংস্কার ও আচারের চেয়ে মানুষকেই সত্য বলে তিনি মেনেছেন। যুগে যুগে বাংলায় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক বাস করে আসছে। তাদের ভাবসাধনা ও চিন্তাধারা কখনো বিচ্ছিন্ন থাকেনি, বরং বিরোধ ও মিলনের মধ্য দিয়ে এসব ধর্মসাধনা সংশ্লেষাত্মক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। বাঙালির আদি ধর্মদর্শন হচ্ছে সাংখ্য যোগ তন্ত্র ইত্যাদি এবং এগুলোর সবই অনার্যসম্ভূত। পরে বাংলাদেশে আর্যায়নের সূত্রে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আগমন হয় ; এরপরে ইসলাম ধর্মের এবং আরও বহু পরে আঠার শতকে খ্রিস্টান ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। যুগে যুগে আগত এইসব ধর্মভাবসাধনা বাঙালির চিত্তভূমিকে প্লাবিত করেছে এবং নতুন ফসলের ভাববীজ রোপণ করেছে। ইতিহাসের ধারায় এই সত্য স্পষ্ট হয়েছে যে, বিজয়ী জাতির ধর্মচিন্তা ও সংস্কৃতি ভাবনা বিজিত জাতির উপর প্রভাব ফেলে। তবে বিজিত জাতির সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য-শক্তি যদি থাকে, তাহলে তা বিজয়ী জাতির সংস্কৃতিকেও বশ করতে পারে। বাঙালির মনন-বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতা অবশ্যই আছে। আহমদ শরীফ বলছেন, "বাঙালী

বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু কোন ধর্মই যে অবিকৃত রাখেনি। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলামকে সে নিজের পছন্দমতো রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে।"[৩]

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয় ঘটেছে। এই সমন্বয়ী রূপের প্রকাশ দেখা যায় বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, নাথ, বৈষ্ণব, বাউল, সুফি, পীর ইত্যাদি ধর্মমতে। যোগতন্ত্রে কায়া সাধনার যে পদ্ধতি রয়েছে তাও তান্ত্রিক বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য, নাথপন্থ, বৈষ্ণব, বাউল, সুফি প্রভৃতি ধর্মচিন্তায় অনুসৃত হয়েছে। বাংলার যাবতীয় ধর্মমতপথ নিয়ে যেসব গুরুতর আলোচনা ও গবেষণাকর্ম রয়েছে সেগুলির সঙ্গে আহমদ শরীফের গাঢ় যোগাযোগ অধ্যয়ন-সূত্রে ঘটেছে। পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের যুক্তি, বুদ্ধি, চিন্তা ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আহমদ শরীফের বিদ্যাবুদ্ধির জগৎ অবশ্যই আলোকিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, সব ক্ষেত্রেই আহমদ শরীফ তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও অভিমতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর প্রজ্ঞালব্ধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

বাংলার ধর্মসাধনার ধারায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির স্থায়ী প্রভাবের কথা বহুবিদিত; এমনকি বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালির বিশ্বাস সংস্কার ও আচারে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি কোন-না-কোনভাবে রয়ে গেছে। আহমদ শরীফ এই বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন এবং এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন যে, "বাঙলার বৈষ্ণব-সহজিয়া, বাউল ও সূফী সাধনা নামান্ত রে বৌদ্ধ যোগতান্ত্রিক সাধনাই।"[৪] চর্যাগীতি প্রসঙ্গে আহমদ শরীফের বিস্তৃত আলোচনা আছে তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে। সে আলোচনায় তিনি চর্যাপদে ব্যক্ত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন-পদ্ধতির পরিচয় দিয়েছেন এবং বলেছেন এ সাধনা মূলত কায়া সাধনা। বাঙালির দেহকেন্দ্রিক সাধনা সম্বন্ধে আহমদ শরীফের ধারণা, বিচার-বিশ্লেষণ ও অভিমত খুব উঁচু। তিনি বলেছেন, "বাঙালী চিরকাল দেহতত্ত্ব দিয়েই জীবন-রহস্য ও জগৎ-তত্ত্ব বুঝবার সাধনা করেছে। এভাবেই তার আনন্দিত জীবন-স্বপ্ন রূপ পেয়েছে। সবটাই অবশ্য আত্মরতিপ্রসূত আত্মসাধনসম্পৃক্ত। তবু সংকীর্ণ সরণীতে হলেও সে উচ্চ মার্গের সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তায় সমর্থ হয়েছে। মানব-মনীষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর এ অবদান চিন্তাজগতে তথা বিশ্বের মনন-সাহিত্যে আমাদের কীর্তিমিনার"।[৫] 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সাহিত্য' আহমদ শরীফের বিদ্যাচর্চার একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যের আওতায় পড়ে ধর্মসাহিত্য, নাথ সাহিত্য, গোরক্ষ বিজয়, সহজিয়া সাহিত্য, যোগতান্ত্রিক সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, বাউল সাহিত্য, সুফি সাহিত্য ইত্যাদি। দেহচর্যা কেন্দ্রিক এইসব ধর্মমত ও শাস্ত্রাচার বিষয়ে আহমদ শরীফের বিশদ পরিচয়জ্ঞাপক ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা আছে। নাথপন্থ, বৈষ্ণব সহজিয়াপন্থ ও বাউল মত যে মৈথুনতত্ত্ব সম্ভূত একথা তিনিও জোর দিয়ে বলেছেন। বৌদ্ধ সহজিয়ারাই হিন্দুয়ানির আবরণে বৈষ্ণব সহজিয়া নাম ধারণ করেছে এবং রাধাকৃষ্ণ রূপকে সাধন ভজন করেছে। *বাউলতত্ত্ব* নামের গ্রন্থ আহমদ শরীফ প্রণীত। বাউল মতের উদ্ভব সম্পর্কে তিনি বিস্তর তথ্য উত্থাপন করেছেন এবং বলেছেন বাউল সাধনা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। বাউলেরা আত্মাবাদী ও পরমাত্মা সন্ধানী। তবে জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি, সেজন্য নিজেকে ভালো করে উপলব্ধি করাই তাদের সাধনার মূল মর্ম। সুফি সাধকেরাও আত্মাকে জানার সাধনায় নিয়ত নিয়োজিত। আহমদ শরীফের অভিমত, বাউল মতের

উদ্ভবে সুফি তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সুফি ধর্মের উৎপত্তি ইরানে। সুফি ধর্ম প্রেমবাদী এবং এর নানা উপমতও আছে। প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টাকে অনুভব করাই এই মতের মর্মকথা। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম অভিযান ও বিজয়ের ফলে ভারতে সুফি ধর্মের প্রবেশ ঘটে। কিন্তু আগত এই ধর্মমত ভারতীয় তন্ত্র, যোগ ও দেহসাধন রীতির প্রভাবে দেশজ রূপ গ্রহণ করে এবং গুরুবাদী হয়ে ওঠে। বাংলার সুফি সাধনা প্রসঙ্গেও একই কথা। বাংলায় সুফিধর্ম নিয়ে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা অবশ্যই স্মর্তব্য ; কিন্তু সুফিমত ও সুফি সাহিত্য বিষয়ে আহমদ শরীফের অধ্যয়নও গভীর। *বাঙলার সূফি সাহিত্য* নামের গ্রন্থ তিনিই প্রণয়ন করেছেন এবং সুফি কবিদের রচনার সংকলনও করেছেন তিনি। বাংলা ভাষায় মুসলিম ধর্মসাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা চিত্তাকর্ষক ও মননসমৃদ্ধ। এবং এ নিয়ে তাঁর অভিমতও তাৎপর্যপূর্ণ—"ভারতবর্ষে দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কার তো ছিলই, আর্যপূর্ব যুগের দেশজ সংস্কারও ছিল। এভাবে শরীয়ৎ ও দেশজ আচারের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের তথা বাঙালী মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতি। তাই এদেশে রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে অবিমিশ্র শরীয়ৎ কথা পাইনে, মরমীদের বিভিন্ন মোকাম-মঞ্জিলের সঙ্গে লৌকিক আচারের রীতিও পাই।"[৬] একে অন্য কথায় লৌকিক ইসলামও বলা যেতে পারে। লৌকিক ইসলামে যে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা রয়েছে তা বাংলার প্রাচীন বিশ্বাস সংস্কার ও যোগচিন্তা নির্ভর। এ শ্রেণীর মুসলিম ধর্মসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞান প্রদীপ* ও *জ্ঞান চৌতিশা*, শেখ ফয়জুল্লাহর *গোরক্ষ বিজয়*, হাজী মুহম্মদের *নূর জামাল*, মীর মুহম্মদ সফীর *নূরনামা*, আলী রজার *আসল-জ্ঞান সাগর*, শেখ মনসুরের *শির্নামা*, শেখ জাহিদের *আদ্য পরিচয়* ইত্যাদি। অবশ্য শরীয়তী ইসলামের বিকৃতির প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল অচিরে ; তখন ইসলাম ধর্মের মর্ম, মাহাত্ম্য ও প্রকৃত ধর্মকথা নিয়েও পুস্তক রচিত হতে থাকল। আলাউলের অনুবাদমূলক রচনা *তোহফা* শরীয়তী ইসলামের রীতিনীতি বিষয়ক। এর সঙ্গে যুক্ত হবে আরও কিছু পুথিপুস্তক, যথা— শেখ পরানের *কায়দানী কেতাব*, শেখ মুত্তালিবের *কিফায়তুল মুসল্লিন* ও *কায়দানী কিতাব*, আফজল আলীর *নসিহতনামা*, নসরুল্লাহ খোন্দকারের *শরীয়তনামা* ও *হেদায়তুল ইসলাম*, আবদুল করিম খোন্দকারের *হাজার মসায়েল ও নুরনামা*, মুজাম্মিলের *নীতিশাস্ত্রবার্তা*, আবদুল হাকিমের *শাহাবউদ্দীন নামা*, মুহম্মদ মুকিমের *কায়দুল মুকতদী*, সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের *সিরাজ সবিল*, বালক ফকিরের *কায়দুল মুকতদী*, মুহম্মদ ফসিহ-এর *আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত* ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ। মুসলিম ধর্মসাহিত্যের মধ্যে সওয়াল সাহিত্য পর্যায়ের তত্ত্ব ও শাস্ত্রজ্ঞানমূলক রচনা এবং চরিত গ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত। চরিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* ও *রসুল চরিত*, জয়েনউদ্দীনের *রসুল বিজয়* ইত্যাদি সুপরিচিত। মুসলিম ধর্মসাহিত্য প্রসঙ্গে আহমদ শরীফের তথ্যানুসন্ধান, আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। আগেই বলা হয়েছে যে, আহমদ শরীফ মুসলিম ধর্মসাহিত্যের একাধিক গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন।

চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলন নিয়ে এদেশে আহমদ শরীফের চেয়ে বিস্তৃত আলোচনা আর কেউ করেন নি। আহমদ শরীফ বৈষ্ণব কবিতার সংকলন করেছেন, মুসলিম কবিদের রচিত পদাবলি নিয়ে বই লিখেছেন এবং ব্রজমোহন দাসের *চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ* পুথির সম্পাদনাও করেছেন।

ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভবের ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামের প্রভাব, চৈতন্যের জন্মবৃত্তান্ত, চৈতন্য মতবাদ, বৈষ্ণব শাস্ত্রের রূপরস ও তত্ত্ব, চৈতন্য চরিতাখ্যান, পদাবলি ও পদকার সম্বন্ধে আহমদ শরীফের আলোচনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অভিমত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। অন্যদের মতো আহমদ শরীফও বলেছেন চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে সুফি মতের প্রভাব রয়েছে। এই সূত্রে বাংলার ভাব-সাধনায় চৈতন্যের অবদান প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন— "সূফী প্রভাবে অন্যদের মতো বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্বকে সূক্ষ্মতর চেতনায় লব্ধ অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত স্বরূপে উপলব্ধি করা এবং ভক্তিকে প্রেমে উন্নীত করাই ছিল এদেশের—ভারতবর্ষের ধর্মদর্শনে ও দার্শনিক তত্ত্বভাবনায় চৈতন্যদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।"[৭] চৈতন্য মতবাদের প্রভাবে সৃষ্ট বাংলার ভাব বিপ্লব প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ একাধিক আলোচনায়[৮] মন্তব্য করেছেন যে ষোল শতক বাঙালির রেনেসাঁর যুগ। সমন্বয়ী ধর্মভাবনার এটাও একটা দিক যে, মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমান কবিরাও বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করছিলেন। অবশ্য এরা কেউ বৈষ্ণব ছিলেন না, কিন্তু সুফি মতের অভাবে তাঁরা বৈষ্ণবের রাধা-কৃষ্ণ রূপকে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনকামী ছিলেন।

সমন্বয়ী ধর্ম-সাধনার আরেকটি দৃষ্টান্ত সতের-আঠার শতকে রচিত *পীর-পাঁচালি*, যাকে আহমদ শরীফ বলেছেন আপোসমুখী সাহিত্য। পীর নারায়ণ সত্যকে অবলম্বন করে এই পাঁচালি রচিত হয়েছে। 'সত্য' দুঃখী নির্জিত পীড়িত সাধারণ মানুষের ইষ্ট দেবতা। মুসলমানেরা দেবতা বিশ্বাসী নয় বলে এই ইষ্টদেবতা তাদের কাছে সত্যপীর, আর হিন্দুর কাছে তা সত্যনারায়ণ। এই লৌকিক ইষ্টপুরুষ বা দেবতাকে নিয়ে বহু পুথি রচিত হয়েছে। আহমদ শরীফ পীর-পাঁচালি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এবং পাঁচালিকারদের পরিচিতিসহ পীর নারায়ণ সত্যের উদ্ভব প্রসঙ্গে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন।

সুতরাং, বোঝা যায়, বাংলার ধর্মসাধনা, ভাবধারা ও মনন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আহমদ শরীফ তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অসামান্য পরিচয় দিতে পেরেছেন। লক্ষণীয়, আহমদ শরীফের সকল অভিমত, চিন্তা ও যুক্তি ইতিহাসের উপাত্তনির্ভর এবং কার্যকারণ সূত্রে পরিব্যক্ত। বাংলা, বাঙালি, বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস, বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বাংলার ধর্মমতধারা ইত্যাদি আহমদ শরীফের বিদ্যাচর্চার বিষয়। এসব নিয়ে লেখার অন্তর্তাগিদ আহমদ শরীফ সবসময় অনুভব করেছেন এবং রচনায় নিজস্ব চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলার ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাঙালির পরিচয় ও স্বভাববৈশিষ্ট্য, বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আহমদ শরীফের অসংখ্য রচনা রয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বাঙলা ভাষা সাহিত্যের খসড়া চিত্র, বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা, দোভাষী পুথির ভাষা, পুথি সাহিত্যের ইতিকথা, বাউল সাহিত্য, বাঙলা সাহিত্যের আঁধার যুগের ইতিহাস, বাঙলা প্রণয়োপাখ্যানের উৎস, বৈষ্ণব মত ও বাঙলা সাহিত্য, বাঙালির সংস্কৃতি, বাঙলা ও বাঙালি, ইতিহাসের ধারায় বাঙালি, বাঙলার ধর্ম, বাউলতত্ত্ব, বাঙলার সূফী প্রভাব, বাঙালির মনন বৈশিষ্ট্য, বাঙালী সত্তার স্বরূপ সন্ধানে, বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে, বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, বাঙলার রাজনীতিক ইতিহাস, ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালি, বাঙলার সমাজে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান, চৈতন্য মতবাদ ও ইসলাম, চৈতন্যদেবের ভাববিপ্লব : তার তাৎপর্য ও পরিণাম, ইতিহাসের দর্পণে দুই শতকের বাঙালি,

ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস, বাংলাদেশের শতবর্ষের ইতিবৃত্তান্ত প্রভৃতি। এইসব রচনা বুঝিয়ে দেয় বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে আহমদ শরীফের অনুসন্ধিৎসা ও অনুরাগ কত গভীর! এই অনুরাগের উদাহরণ তাঁর *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১৯৭৮, ১৯৮৩) নামের সুবিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ, স্বদেশ সম্পর্কিত তাঁর চিন্তা চেতনার পরিচয়জ্ঞাপক গ্রন্থ *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০) ও *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব* (১৯৯২), *কালের দর্পণে স্বদেশ* (১৯৮৫) এবং মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতি বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ *মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (১৯৭৭)। মধ্যযুগের বাংলা পুথির গবেষণা করতে গিয়ে আহমদ শরীফ তাঁর দেশ, জাতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে যে বিপুল বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তারই অভিপ্রকাশ হল উপর্যুক্ত প্রবন্ধাবলি ও গ্রন্থসমূহ।

তথ্যনির্দেশ

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *Bengali Literature* (১৮৭১)
রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৭২-১৮৭৩)
রমেশচন্দ্র দত্ত, *The Literature of Bengal* (১৮৯৫)
দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (১৮৯৬)

২. আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন অনধিক ছয়শ পুথি। তিনিই পুথিগুলোর পরিচায়িকা তৈরি করেছিলেন। পরে এটি *পুথি পরিচিতি* নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (১৯৫৮)। *পুথি পরিচিতি*র ইংরেজি অনুবাদ করেন ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts* শিরোনামে (১৯৬০)।

৩. 'বাঙালীর মনন-বৈশিষ্ট্য', *কালিক ভাবনা* (১৯৭৪), মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৬৮

৪. *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* ১ম খণ্ড (১৯৭৮), বর্ণমিছিল, ঢাকা, পৃ. ২১৯

৫. 'বাঙালীর মনন-বৈশিষ্ট্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৬. *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* ২য় খণ্ড (১৯৮৩), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৬০৪

৭. 'চৈতন্যদেবের ভাব বিপ্লব : তার তাৎপর্য ও পরিণাম', *এবং আরো ইত্যাদি* (১৯৮৭), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৭০

৮. 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়া চিত্র', *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮)
বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ২য় খণ্ড (১৯৮৩)
'চৈতন্য মতবাদ ও বাঙলা সাহিত্য', *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯)
'চৈতন্যদেবের ভাব বিপ্লব : তার তাৎপর্য ও পরিণাম', *এবং আরো ইত্যাদি* (১৯৮৭)